ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ ঃ প্রশাসন ও সামন্ত প্রভুদের ভূমিকা

মোঃ শরীফ হাছান *

Great Revolt of 1857 : Role of Administration and Feudal Lords. Md. Sharif Hasan

Abstract : The revolt of 1857 is a glorious chapter in the history of Indian sub continent. British dominance began in this subcontinent in 1757 after the war of Plassey. The British rulers started exploitation in this land. The revolt was an outburst of the misrule of the British East India Company who represented the British crown. In northern India, the revolt became a people's war. The Deccan and eastern part of India remained almost unaffected. The revolt continued until 1859. It ended with a failure. The British administrators put the situation under control through their dynamism and ruthlessness. Most of the landlords and native members of the administration sided with their British masters. On the other hand, the rebels lacked able leadership and unity. However, the revolt will ramain as a source of inspiration for the freedom loving people of the whole world. The study aims to analyse the main reasons specially the influence of colonial exploitation and land management for the revolt, its major events and reasons of its failure with special reference to the role of British administration and local landlords to calm down the rebellion.

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা হয়। পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশ ব্রিটিশ শাসকদের করতলগত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকগণ অন্যান্য উপনিবেশের মতো ভারতবর্ষে শুরু করে শোষণ, নির্যাতন সর্বোপরি নির্বিচার সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচার। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী বিস্তৃত হলেও প্রধানতঃ উত্তর ও মধ্যভারতেই বিদ্রোহের প্রকোপ ছিলো সবচেয়ে বেশী। ১৮৫৭ সালে সূচিত হওয়া এ বিদ্রোহের স্থায়িত্ব ছিলো ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত। বস্তুত এটা ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে

* সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

এর সমাপ্তি ঘটলেও এ বিদ্রোহ সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হবে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অভিনবত্ব এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর প্রসারে, ব্রিটিশ শক্তির বিপদের গুরুত্বে এবং এতে বেসামরিক জনগণের অংশগ্রহণে (বন্দোপাধ্যায়,১৯৮৬)।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে নিছক সিপাহি বিদ্রোহ অথবা স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে কিনা এনিয়ে এক সময় ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য থাকলেও বর্তমানে এ বিষয়ে অধিকাংশ লেখক ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করলে এর গুরুত্বকে খাটো করা হবে। আনুমানিক প্রায় তিন কোটি লোক এ মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। উত্তর প্রদেশসহ কিছু কিছু এলাকায় এ বিদ্রোহে জমিদার এবং আপামর জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করে। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতে এ বিদ্রোহের তেমন প্রভাব পড়েনি। তাছাড়া জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলোনা।

তবে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিরন্তর শোষণ, লুণ্ঠন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আপামর জনগণের মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয় যার সশব্দ প্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মাধ্যমে। ১৮৫৭ সালের ২৩শে জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় ডিজরেইলী এ বিদ্রোহকে সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত না করে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম হিসেবে আখ্যায়িত করেন (Marx and Engels, 1988)। প্রধানত ইংরেজ এবং তাদের অনুগ্রহপুষ্ট ফরমায়েশী লেখকগণই এ মহাবিদ্রোহকে নিছক সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্রিটিশ শাসকদের সীমাহীন অন্যায়, অবিচারকে আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিদ্রোহীদের মাঝে অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন নেতার অভাব ছিলো। বাহাদুর শাহ্, নানা সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, তাতিয়া তোপী, বখত খাঁ, মৌলভী আহমদুল্লাহ প্রমুখের দেশপ্রেম ও নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত হলেও এই সংগ্রামকে সাফল্যমন্ডিত করার মতো যোগ্যতা তাদের ছিলোনা। অস্ত্রশস্ত্র ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় ছিলো দুর্বলতর। অন্যদিকে ব্রিটিশ বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে বিদ্রোহীদের চেয়ে ছিলো অনেক শক্তিশালী।

তাদের শৃঙ্খলাবোধ ছিলো কিংবদন্তী তুল্য। উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে একটি আধুনিক এবং সংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ-দেশীয় নির্বিশেষে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির প্রভুদের সর্বতোভাবে সহায়তা করে। কোম্পানির চাকুরীতে নিয়োজিত ভারতীয় বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিদ্রোহের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের বিদেশী প্রভুদের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য বজায় রাখে। উপরন্ত ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উপমহাদেশে ব্রিটিশের অনুগত জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। নব প্রতিষ্ঠিত এ জমিদার শ্রেণী বিদ্রোহ দমনে অস্ত্র, অর্থ ও লোকবল দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সাহায্য করে। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ প্রভুদের সপক্ষে দেশীয় নৃপতি ও জমিদারদের নৃশংসতা ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের শ্বেতকায় প্রভুদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে, ব্রিটিশ কোম্পানির প্রতি দেশীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ভূস্বামী শ্রেণীর সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা ও আনুগত্য এ সংগ্রামে ব্রিটিশ শাসকদের জয়লাভ এবং বিদ্রোহীদের পরাজয় ত্বরান্বিত করতে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।

প্রধান প্রধান কারণসমূহঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ মুখ্যত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের ব্যাপকতা, অর্থনৈতিক শোষণ, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে দেশীয় ও ইংরেজ কর্মচারীদের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বৈষম্য এবং দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। এছাড়া ইংরেজ শাসকদের কিছু কিছু সমাজ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ যেমন সতীদাহ প্রথা, নরবলি, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি কুপ্রথা রদ করার ফলে জনগণের একাংশ শাসক শ্রেণীর উপর ক্ষুব্ধ হয়। যেমন, লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিংক (১৮২৮-৩৫) এর সময় সতীদাহ প্রথা বাতিলের পক্ষে বড়লাট বরাবর তিনশত দরখাস্ত জমা পড়ে অন্যদিকে এ প্রথা বহাল রাখার পক্ষে জমাকৃত দরখাস্তের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজারের বেশী (গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, ১৯৯০)। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালা গ্রহণ করে। কোম্পানি প্রশাসনের গ্রাসের কবলে পতিত হতে থাকে একে একে দেশীয় রাজ্যগুলো। লর্ড হেস্টিসের যুদ্ধবাদী নীতি, লর্ড ওয়েলেসলির

অধীনতামূলক মিত্রতা, লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতির মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের ক্রমে ক্রমে তাঁদের রাজ্য থেকে উৎখাত করা হয়। নাগপুর, উদয়পুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর, বেরার এভাবে কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোম্পানি প্রশাসনের এ সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার ফলে উপমহাদেশের অধিকৃত ভূ-খন্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। পূর্বতন রাজা, ভূস্বামী এবং তাদের সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বেকার ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর পঁচাত্তর হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণকে দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় (কবিরাজ ১৯৮০)। এভাবে বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের পিতৃপুরুষের আমলের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে এ শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোম্পানির কুশাসনের ফলে জনগণের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কায়েম করে দ্বৈত শাসন। এ ব্যবস্থায় শাসন ও বিচার সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলার দুর্বল নবাবের উপর। অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় কোম্পানির হাতে। ফলে সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা। নবাবের দুর্বলতা, ইজারাদারদের অত্যাচার, পীড়নে জনজীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। এহেন সীমাহীন অপশাসনের ফলে ইংরেজী ১৭৭০, বাংলা ১১৭৬ সালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিতি। বাংলার প্রায় অর্ধেক লোক এ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় (ইসলাম ও অন্যান্য, ১৯৮৭)। বহু জমিদার হয় দস্যুদলকে আশ্রয়দান করে অথবা নিজেরাই দস্যুদল গঠন করে লুটতরাজ চালাতে থাকে।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। জমিদারগণ বছরে নির্ধারিত হারে খাজনা পরিশোধ করে চিরস্থায়ীভাবে জমিদারি ভোগের অধিকার লাভ করেন। এর ফলে ইংরেজদের অনুগত একটি ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ কোম্পানির নির্ধারিত হারে বার্ষিক খাজনা লাভ নিশ্চিত হয়। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো সূর্যাস্ত আইন। এ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমিদারের জমিদারি

অধীনতামূলক মিত্রতা, লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতির মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের ক্রমে ক্রমে তাঁদের রাজ্য থেকে উৎখাত করা হয়। নাগপুর, উদয়পুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর, বেরার এভাবে কোম্পানির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোম্পানি প্রশাসনের এ সাম্রাজ্যবাদী নীতিমালার ফলে উপমহাদেশের অধিকৃত ভূ-খন্ডের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসে। পূর্বতন রাজা, ভূস্বামী এবং তাদের সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীগণ বেকার ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পর পঁচাত্তর হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করা হয়। পঁচিশ হাজার ব্রাহ্মণকে দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয় (কবিরাজ ১৯৮০)। এভাবে বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোককে তাদের পিতৃপুরুষের আমলের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে এ শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোম্পানির কুশাসনের ফলে জনগণের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কায়েম করে দ্বৈত শাসন। এ ব্যবস্থায় শাসন ও বিচার সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলার দুর্বল নবাবের উপর। অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয় কোম্পানির হাতে। ফলে সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা। নবাবের দুর্বলতা, ইজারাদারদের অত্যাচার, পীড়নে জনজীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। এহেন সীমাহীন অপশাসনের ফলে ইংরেজী ১৭৭০, বাংলা ১১৭৬ সালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিতি। বাংলার প্রায় অর্ধেক লোক এ দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় (ইসলাম ও অন্যান্য, ১৯৮৭)। বহু জমিদার হয় দস্যুদলকে আশ্রয়দান করে অথবা নিজেরাই দস্যুদল গঠন করে লুটতরাজ চালাতে থাকে।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা। জমিদারগণ বছরে নির্ধারিত হারে খাজনা পরিশোধ করে চিরস্থায়ীভাবে জমিদারি ভোগের অধিকার লাভ করেন। এর ফলে ইংরেজদের অনুগত একটি ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ কোম্পানির নির্ধারিত হারে বার্ষিক খাজনা লাভ নিশ্চিত হয়। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো সূর্যাস্ত আইন। এ আইন অনুসারে নির্দিষ্ট দিনে খাজনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমিদারের জমিদারি

বাজেয়াপ্ত করা হতো। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জমিদারিগুলির প্রায় অর্ধেক পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। এটাও মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুতে রেখেছিলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অন্যদিকে জমিদারগণ প্রজাদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো রাজস্ব আদায় করতে পারতেন। জমিদার এবং তাদের ইজারাদার, লাঠিয়ালদের অত্যাচারে অনেক কৃষক সর্বস্ব হারায়। এদের অনেকে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। কোম্পানী এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষির উন্নয়ন ঘটেছিলো। প্রকৃত ঘটনা তা নয়। কৃষির কৌশল ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধন করে সমপরিমাণ জমিতে অধিক ফসল ফলানো এবং উদ্বৃত্ত ফসল লাভজনকভাবে বাজারজাত করার ব্যবস্থাকে বলা যায় কৃষির উন্নতি, আর চিরাচরিত কৃষি কৌশলের অধীনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে পতিত জমি আবাদ করা হয় তা হচ্ছে কৃষির সম্প্রসারণ। সে সম্প্রসারণে কৃষকের অর্থনীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষির উন্নতি হয়নি। কৃষির সম্প্রসারণ হয় (ইসলাম ও অন্যান্য, ১৯৮৭)। এ ব্যবস্থার ফলে বঙ্গদেশের কৃষক সর্বনাশের চরম সীমায় উপনীত হয়।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ শুরু করে। কোম্পানির সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন ছিলো অর্থনৈতিক শোষণের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার স্বরূপ। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনাকাল হিসেবে ধরা হয় ১৭৬০ সালকে। ভারত থেকে লুণ্ঠিত অর্থ সম্পদ এ বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপমহাদেশের শিল্পপতিরা ইংল্যান্ডের বাজারে প্রবেশাধিকার যাতে না পায় সেজন্য ১৭০১ এবং ১৭২৯ সালে ইংল্যান্ড ভারতে প্রস্তুত শিল্পজাত পণ্যের আমদানী নিষিদ্ধ এবং আমদানীকৃত ভারতীয় তুলার উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে দেয়। ১৭৫৭ সালের পর কোম্পানির শাসকেরা ভারতে তাদের পণ্যের একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠার লক্ষে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনে নিয়োজিত হয়। বাংলার মসলিনের খ্যাতি ছিলো বিশ্বজোড়া। বিলাতী কাপড়ের বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে মসলিন শিল্প ধ্বংস করে দেয়া হয়। এমনকি মসলিন শিল্পীদের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কেটে নেয়া হয় এবং যাবতীয় দেশীয় পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক

আরোপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৮৪০ সালে মন্টগোমারী মার্টিন বলেন, গত পঁচিশ বছর ধরে আমরা ভারতকে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছি, অথচ ঠিক এই পঁচিশ বছর ধরে আমরা ব্রিটেনে রপ্তানীকৃত ভারতের পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছি। এই শুল্ক ১০% থেকে ২০%, ৩০%, ৫০%, ১০০%, ৫০০% এমনকি ১০০০% পর্যন্ত উঠেছে। কাজেই ভারতের সঙ্গে খোলা বাজার স্থাপনের চেষ্টা চলছে বলে যে রব উঠেছে সেটা একটা ধুয়া মাত্র। আসলে ইংল্যান্ড ভারতে খোলা বাজারের অধিকার পেয়েছে, ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে খোলা বাজারের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি (কবিরাজ, নরহরি ১৯৮৭)। একদিকে বিলাতী পণ্যে ভারতীয় বাজার হতে থাকে সয়লাব অন্যদিকে দেশীয় শিল্প ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। কোম্পানির প্রশাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে অধিকতর খারাপের দিকে যেতে থাকে। বিরাট শহরগুলো ধীরে ধীরে শ্মশানে পরিণত হয়। ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত মেশিনে তৈরী তুলাজাত জিনিসপত্র যেমন তাতিঁদের ধ্বংস ডেকে আনে, তেমনি মেশিনে তৈরী সূতা তাদের জীবিকা নষ্ট করে দেয়। কার্ল মার্কস বলেন ঃ From 1818 to 1836 the export of twist from Great Britain to India rose in the proportion of 1 to 5200. In 1824 the export of British Muslins to India hardly amounted to 1000000 yards, while in 1837 it surpassed 64000000yards. But at the same time the population of Dacca decreased from 150000 inhabitants' to 20000" (Marx উদ্বৃতি কবিরাজ, ১৯৮৭)।

১৭৮৭ সালে ঢাকা থেকে ইংল্যান্ডে মসলিন চালান যেত ৩০ লক্ষ টাকার, ১৮১৭ সালে এই চালান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। নিরন্তর শোষণের ফলে ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ তাঁতি এবং কুটির শিল্পে নিয়োজিত কারিগর ও শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। অসংখ্য সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবার কাজের সন্ধানে শহর ছেড়ে জীবিকার খোঁজে গ্রামে চলে আসতে বাধ্য হয়। ১৭৫৭ সালে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ শহরকে লন্ডনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ১৮৪০ সালে মুর্শিদাবাদ শহর শ্মশানে পরিণত হয়। ব্রিটিশ বণিকদের মুনাফার স্বার্থে প্রবর্তিত হয় নীলচাষ।

ধানের জমিতে নীলচাষ করা হয়, অন্যদিকে চাষীদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করা হয়। চাষীরা নীলকরদের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে পড়ে। এভাবে এদেশী চাষীদের হাতে এবং ভাতে উভয় প্রকারে মারার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করা হয়। মুঘল আমলেও সাধারণ জনগণ অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। তবে তখন শোষণলব্ধ অর্থ ভারতের অভ্যন্তরেই খরচ করা হয়। এটা ছিলো অভ্যন্তরীণ শোষণ। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা শোষণলব্ধ অর্থ ব্রিটেনে পাচার করে। এ শোষণের ফলাফল ছিলো অধিকতর ভয়াবহ। ফলে দেশে বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সামরিক প্রশাসনেও বিভেদমূলক নীতি অনুসরণ করে। কোম্পানির দেশীয় এবং ইংরেজ সৈনিকদের মধ্যে সুযোগ সুবিধার সমতা ছিলোনা। ইংরেজ সৈনিকগণ দেশীয় সৈনিকদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতো। একই পদমর্যাদার একজন দেশীয় সৈন্য যেখানে মাসে নয় টাকা বেতন পেতো সেখানে একজন ইংরেজ সৈনিকের মাসিক বেতন ছিলো চল্লিশ টাকা। দেশীয় সৈনিকগণ দেশবাসীর ঘৃণার পাত্র হয়েও বিদেশী প্রভুদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে কিন্তু সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে তাদের করা হয় বঞ্চিত। ভারতীয় সিপাহিদের পদোন্নতির সুযোগও ছিলো অল্প। একজন ভারতীয় সিপাহিকে সুবেদারের পদের চেয়ে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করা হতোনা। এ সর্বোচ্চ পদের বেতন ছিলো ৬০-৭০ টাকার মধ্যে। বস্তুত একজন সিপাহির জীবন ছিলো যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। ভারতীয় হওয়ার অপরাধে এভাবে হীনতার বোঝা বহন করে চলা সিপাহিদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে টি আর হোমস বলেন যে, একজন ভারতীয় সিপাহি হায়দার আলীর মতো নৈপুণ্য দেখিয়েও কখনো আশা করতে পারতোনা যে তার বেতন একজন সাধারণ ইংরেজ সৈনিকের সমতুল্য হবে। তিরিশ বছর যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার পরও মিলতো না পদোন্নতি। ইংল্যান্ড থেকে সদ্য আগত একজন তরুণ সৈনিকের উদ্ধত আচরণ বা হুকুম তাকে মেনে চলতে হতো (চন্দ্র, বিপিন ১৯৮০)। নিগার, শূয়োর ইত্যাদি সম্বোধন ছিলো তাদের নিত্য দিনের পাওনা।

এ সময় দেশীয় সিপাহিদের ধর্মবিশ্বাস হয়ে পড়ে হুমকীর সম্মুখীন। সামরিক ছাউনীতে সরকারী খরচে পাদ্রী পোষা হতে থাকে। এসব পাদ্রী দেশীয়

সিপাহিদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হয়। উপমহাদেশে প্রচলিত ধর্মগুলো সম্পর্কে পাদ্রীগণ প্রায়ই আপিত্তকর উক্তি করতো। দেশীয় সিপাহিগণ নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করতো। কিন্তু কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এসব নিয়ম কানুন মেনে চলার পথে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিলো যে কোন সিপাহি তার জাতি নির্দেশক কোন চিহ্ন ধারণ করতে পারবে না। এমন কি দাড়ি রাখা, পাগড়ি পরা এবং কপালে তিলক কাটাও নিষিদ্ধ ছিলো। এক্ষেত্রে তাদের কোন আপত্তি বিবেচনায় আনা হতো না। দেশীয় সিপাহিদের অনেক সময় তাদের স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হতো। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে আইন জারী করা হয়েছিলো যে, কোন নবনিযুক্ত সিপাহীকে প্রয়োজনবোধে সাগরপারের কোন দেশে অর্থাৎ ভারতের বাইরে যেতে হতে পারে এবং এক্ষেত্রে কোন ধরনের আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এটা সিপাহিদের কাছে ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিলো। কারণ তখনকার দিনে হিন্দুদের কাছে সাগর পার হওয়া ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী অর্থাৎ জাতিনাশ হিসেবে বিবেচিত হতো। পূর্বে পরদেশে যুদ্ধ করতে গেলে দেশীয় সিপাহিদের অতিরিক্ত ভাতা দেয়া হতো। হঠাৎ কোম্পানির সামরিক প্রশাসন হুকুম জারী করে যে, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে যুদ্ধ করতে গেলে সিপাহিগণ অতিরিক্ত ভাতা বা বাট্টা পাবে না। এতে দেশীয় সিপাহিদের আয় কমে যায় এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। কোম্পানির বহু সিপাহি অযোধ্যার অধিবাসী ছিলো। তাদের মাতৃভূমি ইংরেজ কোম্পানি কুশাসনের মিথ্যা অজুহাতে দখল করে নেয়ার ফলে সিপাহিদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকে বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোম্পানির প্রশাসন নজিরবিহীন নৃশংসতার সঙ্গে এসব বিদ্রোহ দমন করে। কোম্পানির সেবক হওয়া সত্ত্বেও সিপাহিগণ তাদের প্রভুদের এহেন নিষ্ঠুরতায় ভিতরে ভিতরে হয় ক্ষুব্ধ। তারা তাদের সুপ্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

বিদ্রোহের সূচনাঃ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সৃষ্ট কিছু দেশীয় রাজা, জমিদার এবং অনুগ্রহপুষ্ট মুৎসুদ্দী শ্রেণী ছাড়া আপামর জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিলো। ব্রিটিশ কোম্পানি কর্তৃক সূচিত শোষণ এবং নিপীড়নমূলক কর্মকান্ডের দ্বারা হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত

হয়। তাই ভিনদেশী শাসকদের উৎখাত করার লক্ষ্যে তাদের উপযুক্ত সময়ে আঘাত করার জন্য সচেতন জনগণের উৎসাহের অন্ত ছিলো না। কিন্তু সংগ্রামের দিনক্ষণ নির্ধারণ মোটেই সহজ ছিলো না। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ইংরেজ কোম্পানির গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতা এক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ছিলো। বিদ্রোহের উদ্যোক্তাগণ অস্ত্র ও অর্থ বলে বলীয়ান না হলেও মনোবল, সাহস সর্বোপরি দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত ছিলো। বিদ্রোহ শুরুর আগে রক্তবর্ণ পদ্ম ও চাপাটিকে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে ধরে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হলো বিভিন্ন সেনা ছাউনী এবং বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের কাছে। ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী, ফকির ও মাদারীগণ বিদ্রোহের সপক্ষে প্রচারণা শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সিপাহিদের নিয়ে গঠিত রেজিমেন্টগুলো এক গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সর্বাধিক সক্রিয় ছিলেন অযোধ্যার মৌলভী আহমদউল্লাহ, আজিমুল্লা খান, পেশোয়ারে দত্তকপুত্র ধন্দুপন্থ যিনি নানা সাহেব নামে সমধিক পরিচিত। এদের সার্বিক তত্ত্বধানে সহস্রাধিক বার্তাবাহক সাধু, ফকির, মৌলভী, ভিস্তিওয়ালা, ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে বিদ্রোহের বার্তা বহন করে তা পৌঁছে দেয় দূর দূরান্তরে। স্থির হয় যে পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকীর দিন অর্থাৎ ২৩শ জুন ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্রোহ শুরু হবে (ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৬৯)। অন্য মতে ৩১শে মে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়। কোম্পানির সৈন্যদলের তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার সদস্যের মধ্যে দুই লক্ষ সত্তর হাজার ছিলো দেশীয়। অবশিষ্ট মাত্র চুয়ান্ন হাজার ছিলো ইউরোপীয়। বিভিন্ন সেনানিবাসের দেশীয় সিপাহিগণ যখন বিদ্রোহের ডাকের জন্য প্রতীক্ষারত তখন হঠাৎ করে এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন বিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করে। পুরোনো ব্রাউন ব্রাস রাইফেলের পরিবর্তে প্রবর্তিত এনফিল্ড রাইফেল ওজনে ছিলো হাল্কা, এর পাল্লাও ছিলো বেশী। এ রাইফেলের কার্তুজ দাঁত দিয়ে ফেটে রাইফেলে ভরতে হতো। গুজব রটে যে, এ কার্তুজে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত রয়েছে। গরু ও শুকরের মাংস যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট বর্জিত মাংস। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিগণ নিজ নিজ ধর্ম নাশের আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। তারা এ কার্তুজগ্রহণে অস্বীকার করে। কোম্পানি প্রশাসন সিপাহিদের অভিযোগের সারবত্তা যাচাই করেনি। ফলে দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। কার্তুজে গরু ও শুয়োরের চর্বি মিশ্রিত থাকার বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ছিলো গুজব এবং কোম্পানির

কুশাসনের বিরুদ্ধে আসন্ন বিদ্রোহে সিপাহিদের শামিল করার জন্যই পরিকল্পিতভাবে এ গুজব ছড়ানো হয়েছিলো। কোম্পানির প্রশাসন বিদ্রোহ সংঘটনে মৌলভী আহমদউল্লাহ ও নানা সাহেবের নেতৃত্বে চলমান কর্মকান্ড এবং কার্তুজ সংক্রান্ত গুজবের মোকাবেলায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দান করে। এ দুটো ঘটনা কোম্পানি সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে অবস্থিত ৩৪নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর ব্রাহ্মণ সিপাহি মঙ্গল পান্ডে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি প্রশিক্ষণকালে চর্বি মাখানো কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানিয়ে ইংরেজ সৈন্যাধক্ষকে হত্যা করে সকল দেশীয় সিপাহিকে বিদ্রোহ ঘোষণার আহ্বান জানান। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। বিচারে মঙ্গল পান্ডের ফাঁসি হয়। এটা ছিলো একক বিদ্রোহ। উল্লেখ্য মঙ্গল পান্ডের বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ শাসকগণ বিদ্রোহী মাত্রই 'পান্ডি' (Pandey) হিসেবে আখ্যায়িত করতো।

বিদ্রোহের প্রধান প্রধান ঘটনাঃ ১০ই মে ১৮৫৭ সালে মীরাটের দেশীয় সিপাহিগণ বিদ্রোহ করে কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। মোট তিন হাজার বিদ্রোহীর একদল দিল্লীর দিকে রওনা হয়, অপর দল বেরিলিতে বিদ্রোহ সংগঠনের জন্য সেখানে গমন করে। ১২ই মে বিদ্রোহীরা দিল্লী দখল করে আবু জাফর সিরাজউদ্দিন মোহাম্মদ বাহাদুর জাফর শাহ (২য় বাহাদুর শাহ)কে ভারতবর্ষের সম্রাট ঘোষণা করে। যদিও তখন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী মাত্র। আপামর জনগণের সমর্থনের জন্য বাহাদুর শাহকে সম্রাট ঘোষণা করা জরুরী ছিলো। হিন্দু-মুসলমান মিলনের অন্তরায় দূর করার জন্য বাহাদুর শাহ দেশে গো-হত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর যে সকল নৃপতি বিদ্রোহে সহায়তা করেছেন তাদের সমবায়ে গঠিত সংসদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করে তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করবেন। তাঁর এ ঘোষণায় যারা ইংরেজ শাসনের অবসানে ভারতবর্ষে আবার মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তনের আশংকা করছিলেন তাঁরা আশ্বস্ত হন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দিল্লীর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিলো। কিন্তু বাহাদুর শাহ সম্রাট ঘোষিত এবং বিশ সহস্রাধিক বিদ্রোহীর সমাবেশের পর

এর গুরুত্ব আবার বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে দিল্লীই ছিলো বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। তাই ইংরেজগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এমনকি বাইর থেকেও বহু সৈন্যসামন্ত এবং গোলাবারুদ আমদানী করে। আম্বালা থেকে সৈন্য আমদানী করে ইংরেজগণ দিল্লীর উত্তর দিকে অনুচ্চ পাহাড়গুলো প্রথমে দখল করে। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারা শহর দখলের জন্য হামলা শুরু করে। ক্রমাগত ছয়দিন প্রাণপণ চেষ্টা এবং প্রভূত ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকারের পর দিল্লীর প্রসিদ্ধ কাশ্মীরী ফটক কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজগণ শহরে প্রবেশ করে ২০শে সেপ্টেম্বর। বিদ্রোহীদের সর্বাধিনায়ক বখত খানের নগর ত্যাগের অনুরোধ উপেক্ষা করে বাহাদুর শাহ বিশ্বাসঘাতক ইলাহী বখশ ও রজব আলীর পরামর্শে সপরিবারে বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধিভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহের পরিবারের কারো ক্ষতি করা হবেনা ইলাহী বখশ এবং রজব আলীর মারফত ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এ আশ্বাসবাণী পেয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর বাদশাহ বাহাদুর শাহ ক্যাপ্টেন হডসনের নিকট সপরিবারে আত্মসমর্পণ করেন। নিষ্ঠুর হডসন বাহাদুর শাহের দুইপুত্র মির্জা খিজির সুলতান ও মির্জা মুগল এবং পৌত্র মীর্জা আবু বকরকে বিনা কারণে প্রকাশ্যে গুলী করে হত্যা করেন এবং তাঁদের মৃতদেহ কোতওয়ালীর সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দিল্লী দখলের প্রথম তিন দিন প্রায় ছাব্বিশ হাজার নারী পুরুষ শিশু ইংরেজ সৈন্যদের হাতে নিহত হয়। এ সময় মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও পন্ডিত মতিলাল নেহরুর পিতা গোপনে দিল্লী ত্যাগ করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান। পূর্বের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারি লাল কেল্লার দেওয়ানী খাসে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বাহাদুর শাহের বিচার শুরু করে। চল্লিশ দিন শুনানীর পর ১৮৫৭ সালের ৯ই মার্চ বিচারের সমাপ্তি ঘটে। বিচারের রায়ে বাহাদুর শাহের প্রতি চির নির্বাসনের দন্ডাজ্ঞা প্রদান করা হয়। নির্বাসিত বাহাদুর শাহকে প্রথমে পেগু এবং পরে রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হয়। তিন বছর নির্বাসিত জীবন যাপনের পর ১৮৬১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অযোধ্যায় মৌলভী আহমদউল্লাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হয় ৪ঠা জুন ১৮৫৭ সালে। ইতোপূর্বে বিদ্রোহ সংগঠনের প্রস্তুতিকালে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে গ্রেফতার করলে জনগণ তাকে জেল ভেঙ্গে মুক্ত করে। বিদ্রোহীগণ অযোধ্যার নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলীর নাবালক পুত্র বিরজিস কদরকে বাহাদুর শাহের

অধীনে অযোধ্যর নবাব এবং বেগম হজরত মহলকে তাঁর অভিভাবিকা নিযুক্ত করলে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মৌলভী আহমদউল্লার অনুসারীদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহু ইংরেজ সৈন্য হতাহত হয়। অতঃপর মৌলভী ছয় হাজার অনুসারীসহ শহর ত্যাগ করেন। ১৮৫৭ সালের ৫ই জুন মৌলভী আহমদউল্লাহ স্বল্প সংখ্যক অনুচরসহ অযোধ্যা-রোহিলা খন্ডের সীমান্তে অবস্থিত পবাইনে গমন করেন। পবাইনের জমিদার রাজা জগন্নাথ প্রথম দিকে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন। রাজা জগন্নাথ মৌলভীকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে গুলী করে হত্যা করে ব্রিটিশ শাসকগণের কাজ থেকে ৬৫ হাজার টাকা এবং জমিদারী লাভ করেন। বেগম হজরত মহলের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সম্ভবত ইংরেজগণ তাঁকে গুলী করে হত্যা করে। ঝাসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের দত্তকপুত্রের সিংহাসনের দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে ঝাসীতে বিদ্রোহ শুরু হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা প্রবল আকার ধারণ করে। ইংরেজ সেনাপতি স্যার রোজের বাহিনীর হাতে পরাজিত রাণী সসৈন্যে গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন। ইংরেজগণ এখানে পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করে। পুনরায় স্যার রোজ কর্তৃক অতর্কিত আক্রান্ত হয়ে এ বীরাঙ্গনা ১৮৫৭ সালে ১৮ই জুন যুদ্ধরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৫৭ সালের ১৮ই নভেম্বর হাবিলদার রজব আলীর নেতৃত্বে পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁরা ট্রেজারী লুণ্ঠন, কয়েদীদের মুক্তিদান এবং অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্যারাক ত্যাগ করেন। সিলেটের লাটু নামক স্থানে বিদ্রোহীর সঙ্গে যুদ্ধে মেজর বায়ঙ্গ নিহত হন। মনিপুরের তিনটি যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে মনিপুর এবং বার্মা সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় উপস্থিত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহীরা গোলাবারুদের সাহায্যে পশুপাখী শিকার করে ক্ষুন্নি বৃত্তি নিবারণ করে। গোলা বারুদ নিঃশেষ হলে নিজেরাই নরখাদকের শিকারে পরিণত হয় (ওয়ালিউল্লাহ ১৯৬৯)।

১৮৫৭ সালের ৫ই জুন কানপুরের অধিবাসী ও সৈন্যগণ পেশোয়া বাজীরাওয়ের বৃত্তি বঞ্চিত দত্তকপুত্র নানা সাহেবের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল হুলারকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। এ সময় দুইশত ইংরেজ

বন্দীকে হত্যা করা হয়। জুলাই মাসে জেনারেল হেভলক পুনরায় কানপুর দখল করলে কয়েক হাজার ভারতীয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গল অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁর সর্বশেষ পরিণতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

নানা সাহেবের সেনাপতি তাতিয়া তোপী পুনরায় কানপুর দখল করার পর ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়ে কানপুর ত্যাগ করেন। অতঃপর তাতিয়া গোয়ালিয়র আক্রমণ করে সিন্ধিয়াকে পরাজিত করে তা দখল করেন। ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি গোয়ালিয়র থেকে পলায়ন করেন। অতঃপর আরো কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নরবরের বিশ্বাসঘাতক রাজা মানসিংহের চক্রান্তে ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল তিনি ব্রিটিশের হাতে ধৃত হন। ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল সিপ্রিতে প্রকাশ্য স্থানে তাতিয়া তোপীর ফাঁসি হয়। তাঁর প্রাণ বায়ুর সাথে বিদ্রোহেরও প্রাণ বায়ু শূন্যে মিলিয়ে যায় (ওয়ালিউল্লাহ, ১৯৬৯)।

১৮৫৭ সালের ২২শে নভেম্বর ঢাকার লালবাগে অবস্থিত সেনা ছাউনীর গোলন্দাজ বাহিনীর দেশী সিপাহিদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে লেঃ লুইসের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে টিকতে না পেরে সিপাহিগণ বুড়ীগঙ্গা নদীতে নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ঢাকার কাশ্মীরী শাল ব্যবসায়ী এবং জমিদার আবদুল গনি ইংরেজদের কাছে সংবাদ দিয়ে বিদ্রোহিদের ধরিয়ে দিয়ে নবাব উপাধি লাভ করেন। ধৃত সিপাহীদের আস্টাঘরের ময়দানে (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয়।

মহাবিদ্রোহের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষ দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে দেশ মাতৃকাকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে উদ্ধার করার মহান ব্রত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এ মহাবিদ্রোহে। বিদ্রোহের সূচনালগ্নে মীরাটের হিন্দু ও মুসলমান জনগণ আল্লাহু আকবর ও জয় শম্ভুজী শ্লোগান দিয়ে বিদ্রোহের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বেরিয়ে

এসেছিলো রাস্তায় (ইসলাম, ১৯৭৪)। বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক গো-হত্যা নিষিদ্ধের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহের দুই বছর হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছে, মুসলমান হিন্দুর ও হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছে। একে অন্যের অনুসরণে নিঃশংক চিত্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, একসঙ্গে ঝুলেছে ফাঁসিকাষ্ঠে, একই বন্দুকের গুলীতে উভয়ের বক্ষ বিদীর্ণ করেছে এবং উভয়েই মিলিত কণ্ঠে বাহাদুর শাহের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছে। নসরতপুরের রাজা বেণী বাহাদুর যুদ্ধে ব্রিটিশের হাতে পরাজিত হওয়ার পর ব্রিটিশ সেনাপতি তাকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। জবাবে বেণী বাহাদুর বলেন, "দুর্গ রক্ষায় যখন আমি অসমর্থ, তখন তাহা আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছি। কিন্তু আমার দেহের মালিক সম্রাট বাহাদুর শাহ। উহার উপর আমার কোন অধিকার এখন আর নাই" (ওয়ালিউল্লাহ ১৯৬৯)।

ব্যর্থতার কারণসমূহঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ প্রায় দুই বছর চললেও শেষ পর্যন্ত এর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন অর্থাৎ উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন কারণে এ মহান সংগ্রাম ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়।

পলাশীর বিজয়ের পরবর্তী একশত বছরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে একটি শক্তিশালী, শোষণ ও নিপীড়নমূলক এবং সুশৃংখল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। প্রশাসনের উচ্চ পদগুলো সব সময়ই ইংরেজদের দখলে থাকতো। ফলে চরম সংকটের সময় প্রশাসনের নিরংকুশ আনুগত্য লাভে শাসকশ্রেণীর কোনই অসুবিধা হয়নি। বেসামরিক চাকুরীতে নিয়োজিত দেশীয় ব্যক্তিগণ বিদ্রোহের সময় তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন। এটাকে ব্রিটিশ প্রশাসনের কৃতিত্ব বলা যায়। এ সমস্ত দেশপ্রেমবর্জিত কর্মচারী বিপদের সময় লুকিয়ে রেখে, গোপন খবর পাচার করে এবং বিদ্রোহীদের ধরিয়ে দিয়ে তাদের বিজাতীয় প্রভুদের সেবা করেছে অকুণ্ঠভাবে। আলীগড়ের সৈয়দ আহমদ খান চাকুরী রক্ষা ও পদোন্নতির জন্য বিদ্রোহের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন।

ইংরেজদের প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ। ফলে বিদ্রোহীদের অনেক পরিকল্পনাই আগে ভাগে ফাঁস হয়ে যায়। বিদ্রোহ দমনের

লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের দখল থেকে কোন এলাকা কব্জা করা মাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সেখানে নির্বিচার হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন সংঘটন করে যাতে অন্যান্য এলাকার লোকজন এতে ভীত হয়ে বিদ্রোহ করতে সাহসী না হয়। ইংরেজদের হাতে দিল্লীর পতনের পর সেখানে একদিনে ২৪জন মুঘল শাহজাদাকে ফাঁসি দেয়া হয়। এলাহাবাদের পতনের পর সেখানে প্রায় ছয় হাজার অধিবাসীকে হত্যা করে তাদের লাশ রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো। ইংরেজ প্রশাসনের এরূপ নজিরবিহীন নৃংশসতার কারণে অনেক স্থানেই জনগণ ভীত হয়ে বিদ্রোহীদের সহযোগিতা বা আশ্রয়দান করতে সাহসী হয়নি। বিদ্রোহী সিপাহিগণ কোন কোন ক্ষেত্রে লুটতরাজ এবং বেসামরিক ইংরেজদের হত্যা করে। ইংরেজ প্রশাসন এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করে জনগণের মনে বিদ্রোহীদের সম্পর্কে ঘৃণা সঞ্চারে সচেষ্ট হয় এবং আংশিক সফলতাও লাভ করে। অজ্ঞ নিরীহ জনগণের একাংশ বিদ্রোহীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ শুরু করে। যদিও বাহাদুর শাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে বিদ্রোহের অবসানে সম্মিলিত রাজন্যমন্ডলীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন কিন্তু ইংরেজ কোম্পানির প্রশাসন সুপরিকল্পিতভাবে প্রচার করতে থাকে যে এ বিদ্রোহ জয়যুক্ত হলে ভারতবর্ষে পুনরায় ব্রিটিশ পূর্ব যুগের বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হবে। দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে কোম্পানির প্রশাসন রাজা, বাদশাহদের প্রশাসনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিলো। এ অপপ্রচারের ফলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণী মধ্যযুগের বিভীষিকাপূর্ণ, অদক্ষ প্রশাসনের প্রত্যাবর্তনের আশংকায় ভীত হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শ্রেণী এ বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকে।

বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্য এক শ্রেণীর লেখককে নিয়োজিত করা হয়। এ বিষয়ে কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের প্রচারণা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের কোন সংগঠিত প্রশাসন ছিলো না। বাহাদুর শাহ বিদ্রোহের প্রতিকী প্রধান ছিলেন মাত্র। কোন কোন বিদ্রোহী নেতার ঔদ্ধত্যের কাছে তিনি ছিলেন অসহায়। বিদ্রোহীদের মাঝে ঐক্যের অভাব ছিলো। অস্ত্রবলের দিক দিয়েও তারা ছিলো হীন। কোম্পানির টোটা বন্দুকের সামনে

বিদ্রোহীদের গাদা বন্দুক টিকতে পারেনি। ব্রিটিশ প্রশাসন প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অগ্রসর ছিলো। ১৮৫৩ সালে ভারতবর্ষে বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত সর্বপ্রথম ট্রেন চলাচল শুরু হয়। এটা ছিলো কোম্পানির শাসকদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। অধিক সংখ্যক সৈন্য দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়ার জন্য রেলগাড়ী ছিলো অত্যন্ত কার্যকর বাহন। ইতোমধ্যে দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যম টেলিগ্রাফ আবিস্কৃত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন বিজ্ঞানের এ নব আবিষ্কারের সুফল পুরোমাত্রায় ভোগ করে। এ বিদ্রোহকে কেই কেউ সিপাহি বিদ্রোহ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দুই লক্ষ সত্তর হাজার দেশীয় সৈন্যের মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার মহাবিদ্রোহে যোগদান করে। অবশিষ্ট সৈন্যগণ বিদ্রোহে যোগদান করেনি এবং বিদ্রোহ দমনে এদের নৃশংসতা ইংরেজদের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না।

উপমহাদেশে ব্রিটিশ কোম্পানি প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ দমনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাদের সহজাত বৈষয়িক বুদ্ধি বলে অনুধাবন করে যে, একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ষোল লক্ষ বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট এ বিশাল ভূখন্ড সরাসরি শাসনাধীন আনয়ন ও নিয়ন্ত্রণ বাস্তবসম্মত নয়। ভারত বর্ষের দুই তৃতীয়াংশ সরাসরি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন আনয়ন করা হয়। অবশিষ্ট অংশ প্রায় ছয়শত ছোট বড় দেশীয় রাজার শাসনাধীনে থাকে। এ সমস্ত রাজা ব্রিটিশ শাসকদের আনুগত্য স্বীকার এবং নিজ রাজ্যে ব্রিটিশ প্রতিনিধি রাখার বিনিময়ে সীমিত স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি এ সমস্ত রাজার আনুগত্য ছিলো প্রশ্নাতীত। হায়দারাবাদের নিজাম, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ভূপালের বেগম সাহেবা, পাতৌদীর নবাব, নেপালের রাজা প্রমুখ দেশীয় রাজন্যবর্গ এ মহান সংগ্রামের সময় স্বদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে তাদের বিদেশী প্রভুদের সাহায্য করে এ উপমহাদেশকে আরো একশত বছর পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ রাখতে মদদ যুগিয়েছিলেন।

কেবল অযোধ্যা, মীরাট, রোহিলাখন্ড প্রভৃতি এলাকায় এ সংগ্রাম যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিলো। অযোধ্যার মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের যথাক্রমে

শতকরা ৮০ ও শতকরা ৩৩ ভাগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ মহান সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যত্র এ অবস্থা ছিলো ভিন্নরূপ। চিরাস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী প্রথার উদ্ভব হয়। নবোত্থিত এ ভূস্বামী শ্রেণী কোম্পানির সমর্থক ও সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ছিলো স্থায়ী রাজস্বের সংস্থান এবং কোম্পানি-শাসনের প্রতি স্থায়ী সমর্থক শ্রেণী সৃষ্টি করা। সুতরাং কোম্পানির কার্যাবলীর প্রতি ভূস্বামীগণ সমর্থন জানিয়েছেন, কেননা ভূস্বামীগণ উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোম্পানি-শাসনের অবসান ঘটলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর চূড়ান্ত আঘাত আসতে পারে, এমনকি তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। এ সক্ষম হয় যে, স্থানীয় ভূস্বামীগণ তাদের পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করার কারণ উভয়ের স্বার্থ ছিলো পরিপূরক। এ ভূস্বামী শ্রেণী বিদ্রোহ দমনে কোম্পানির শাসকদের দান করে ব্যাপক সহযোগিতা। এদের মধ্যে ঢাকার আব্দুল গনি, ভাওয়ালের কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী, চট্টগ্রামের কালিন্দী রাণী, যশোরের বরদাকান্ত রায় প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এসব ভূস্বামী কোম্পানি শাসকদের সহযোগিতার বিষয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন।

ফলাফল ঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলো ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুশাসন। বিদ্রোহের পূর্ব থেকেই কোম্পানির কুশাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরূপ সমালোচনা চলতে থাকে। ১৮৫৭ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে ভারত শাসনভার ন্যস্ত করে। ব্রিটেনের কেবিনেট মন্ত্রিদের মধ্যে থেকে একজন ভারত সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। ভারত সচিব ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন বলে স্থিরিকৃত হয়। ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া হত্যা, লুট প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যতীত অন্যান্য বিদ্রোহীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমাদের সকল প্রজা তাদের শিক্ষা, সামর্থ্য ও ক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্ম ব্যবস্থায় অবাধে ও নিরপেক্ষভাবে নিযুক্ত হবেন। এ সময় ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভারতীয়করণের দাবী জোরেশোরে উত্থাপিত হতে থাকে এবং ভারতীয়গণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায়

সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভ করতে থাকে। ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ, নির্যাতনে অতীষ্ঠ জনগণের ক্ষোভ যাতে স্বাধীনতার দাবীতে পরিণত হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ও ভারতীয়দের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিদ্রোহ অবসানের পর ইংরেজ শাসকগণ বিদ্রোহী ভূস্বামীদের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। যেহেতু মুসলমান ভূস্বামীগণ অধিক সংখ্যায় বিদ্রোহী হয়েছিলেন তাই এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানগণ অধিকতর ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফলে শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে।

মহাবিদ্রোহের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ব্রিটিশ শাসকগণ স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় থাকলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাই তারা 'বিভক্ত করো ও শাসন করো' নীতির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস নেয়। ব্রিটিশ শাসকগণ কর্তৃক বপণকৃত সাম্প্রদায়িকতার বীজ কালক্রমে পরিণত হয় বিষবৃক্ষে। কখনো হিন্দুর কখনো মুসলমানের হিতৈষী সেজে তারা এ দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পায় যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ছিলো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গা, দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং সর্বশেষে ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ।

উপসংহার ঃ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি। পৃথিবীতে কোন ত্যাগই বৃথা যায় না। বিদ্রোহীদের বীরত্ব অসম সাহস সর্বোপরি নিঃশেষে প্রাণ দান ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। এজন্য ইতিহাসে তাদের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। বিদ্রোহীদের অনেক ত্রুটি, বিচ্যুতি, সীমাবদ্ধতা ছিলো। কিন্তু তাদের অবদানকে সেজন্য অস্বীকার করা যায় না। ব্যর্থতাই সাফল্যের সোপানস্বরূপ। এ সংগ্রামের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চলতেই থাকে। এ সংগ্রাম কখনো ছিলো অহিংস আবার কখনো তা সহিংস রূপ ধারণ করে। এ সংগ্রামের সময় স্বদেশবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে উপমহাদেশের কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মজীবী এবং সামন্তপ্রভু ব্রিটিশ প্রভুদের কৃপাভাজন হলেও মহাকালের অমোঘ বিচারে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম লেখা থাকবে চিরদিন। নিজ জন্মভূমিতে শেষ শয্যার জন্য দুই গজ জমি না জোটায় বাহাদুর শাহ জাফর নিজ

সমাধি গাত্রে লিখিত স্বরচিত কবিতায় নিজেকে 'বদনসীব' আখ্যায়িত করেছিলেন। আশির দশকে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বার্মা সফরকালে বাহাদুর শাহের সমাধি গাত্রে উক্ত কবিতার নীচে বাহাদুর শাহকে "খোশনসীব" (সৌভাগ্যবান) সম্বোধন করে লিখেছিলেন যে, তাঁর মহান আত্মত্যাগই স্বাধীনতার শিখা হয়ে দেশকে স্বাধীন করায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশে পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও সংগ্রামে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চেতনা অগ্নিমশাল হিসেবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

তথ্য নির্দেশিকা

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৬৯) *আমাদের মুক্তি সংগ্রাম।* ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯০) *সেই সময়।* কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

কবিরাজ, নরহরি (১৯৮৭) *স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা* ঢাকা ঃ বাণী প্রকাশ।

মিত্র, গজেন্দ্র কুমার (১৩৮৪) *রাখাল ও রাজকন্যা।* কলিকাতা ঃ মিত্র এ্যান্ড ঘোষ পাবলিশার্স।

ইসলাম, মোজাহারুল (১৯৭৪) *আমি স্মৃতি, আমি ইতিহাস।* ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

বন্দোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র (১৯৮৬) *ভারতের ইতিহাস।* কলকাতা ঃ এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোঃ প্রাঃ লিঃ।

চৌধুরী, রাহমান (১৯৯৫) *মহাবিদ্রোহ ও সম্রাট বাহাদুর শাহ।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

চক্রবর্তী রতনলাল (১৯৯৩) *সিপাহী বিদ্রোহ* সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস।* ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

চন্দ্র, বিপিন (১৯৭৮) *আধুনিক ভারত।* কলকাতা ঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

বিশী, প্রথমনাথ (১৩৮৪) লাল কেল্লা। কলকাতা ঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

ইসলাম ও অন্যান্য (১৯৮৭) *বাংলাদেশের ইতিহাস।* ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

Marx, Karl and Engels, Frederick (1988) *The First Indian war of Independence.* Hascow : Progress Problemes.